ভোরের কাগজ

তারিখ ...
পৃঃ ... কলাম ...

বাংলাদেশের চারুকলা শিক্ষাব্যবস্থা

সমস্যা ও সম্ভাবনা

হাশেম খান

৫০ বছরে চারুকলার শিক্ষাব্যবস্থা এক অন্তহীন সমস্যার ইতিহাস। ইতিহাসের এই দীর্ঘ পথ এ দেশের চারুকলা শিল্পীদের পাড়ি দিতে হয়েছে। হাজারো সমস্যাকে দীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতিক্রম করে আজ ৫০ বছর পার হয়ে বাংলাদেশের চারুকলা এক সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনার রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে– এ কথা বলা যায়।

শিক্ষাব্যবস্থা কতোটুকু সুসংহত হবে বা গুরুত্ব পাবে তা নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতির ওপর। সরকারের মনোভাব– বিশেষ করে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে পারে।

১৯৪৮ সালে চারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠার কলা-চিত্রকলা চর্চার অনুকূলে ছিল না। সেই সময়ের শাসকবর্গ পূর্ব বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ছিল বিভ্রান্ত ও ধর্মীয় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভারত ভাগ, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতা মুসলমানদের জন্য ভিন্ন দেশ– পাকিস্তান, ইত্যাকার এক জটিল অবস্থার-মধ্যে প্রশ্ন উঠলো মুসলমানদের জন্য বা ইসলামিক দেশে ছবি আঁকা, মূর্তি তৈরি ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ। তাই ছবি আঁকার স্কুলের প্রয়োজন নেই। আর ছবি এঁকে কি হবে? চাকরি-বাকরি বা ছবি আঁকার কাজ কোথায়? শুধু শুধু বেকার সমস্যা বাড়বে। ততোদিনে দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার জন্য শিল্পী জয়নুলের খ্যাতি সর্বভারতীয় পর্যায়ে। চারুকলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার অনুকূলে জয়নুলের খ্যাতিকে ঢাকায় নতুন করে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দুর্ভিক্ষ চিত্রমালার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হলো। তাতেও তেমন কোনো ফল হলো না। একই উদ্দেশ্যে ১৯৪৮-এর ১৪ আগস্ট, পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে শিল্পীদের আঁকা এক বর্ণাঢ্য পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হলো। মুসলিম লীগ সরকারকে বোঝানো হলো-রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে সরকারের বক্তব্যকে জনগণের কাছে পৌঁছানোর প্রয়োজনে পোস্টার একটি শক্তিশালী মাধ্যম। পোস্টারগুলোর মূল শিল্পী ছিলেন জয়নুল আবেদিন। সহযোগিতা করেছেন কামরুল হাসান ও তৎকালীন এক উৎসাহী তরুণ আমিনুল ইসলাম। হ্যাঁ, ইনি বর্তমানের শ্রদ্ধেয় শিল্পী আমিনুল ইসলাম। অবশেষে অনেক সমস্যাকে অতিক্রম করে ১৯৪৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের দুটি কামরা ধার করে শুরু হলো প্রাতিষ্ঠানিক চারুকলা শিক্ষা। প্রতিষ্ঠানের নাম হলো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট। মোট ১৮ জন ছাত্র ভর্তি হলো প্রাথমিকভাবে। শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, শফিউদ্দিন আহমদ, খাজা শফিক আহমেদ, হাবিবুর রহমান, কামরুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান এবং কিছুদিন পর শফিকুল আমিন। এঁরা সবাই ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ব্রিটিশ ও পশ্চিমা রীতিনির্ভর কলকাতা আর্ট স্কুলের শিক্ষালাভ করলেও আমাদের এই শিক্ষক-শিল্পীরা অনেকেই অবনীন্দ্রনাথের বেঙ্গল স্কুলের এবং শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসুর চারুকলা চর্চার গুরুত্ব দিতেন, কিন্তু প্রভাবান্বিত ছিলেন না। অন্যদিকে ঢাকায় এসে প্রগতিশীল লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সান্নিধ্যে এসে নতুন দেশ পরিবেশে নিজেদের ঐতিহ্য অন্বেষায় সচেষ্ট হলেন। ফলে চারুকলা শিক্ষাব্যবস্থায় কলকাতা আর্ট স্কুলের মতো পাঠ্যসূচি ও কলাকৌশল পদ্ধতি প্রয়োগ করেও ফলাফল সম্পূর্ণ কলকাতার মতো হলো না। আমাদের নতুন শিক্ষার্থী শিল্পীরা নিজেদের শিল্পশৈলী তৈরিতে সচেষ্ট হলেন।

কলকাতার প্রেক্ষাপট এবং ঢাকার প্রেক্ষাপট এক ছিল না। কলকাতা শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্যে ভারতের এক সমৃদ্ধ ও আধুনিক শহর। আর্ট স্কুলের বয়সও তখন ১০০ বছর। ভারতের সমৃদ্ধ শিল্প ঐতিহ্যের সংগ্রহের এক বিপুল ভাণ্ডার কলকাতা জাদুঘর। এই জাদুঘরেরই একটি অংশে আর্ট স্কুল। ভারতের শিল্প ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেখানে শিল্পকলা অনুশীলন করার সুযোগ রয়েছে।

ঢাকা তখন অনুন্নত ও অবহেলিত একটি পুরোনো শহর। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে কিছু বাজার-ব্যস্ততা ছাড়া ঢিমে তালের জীবন। বাড়িঘর, দালানকোঠা শ্রীহীন। রাস্তাঘাট অপ্রশস্ত। একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নত শিক্ষা ঐতিহ্যই উল্লেখ করার মতো। শিল্পকলা চর্চা বা শিল্প ঐহিত্যের তেমন কোনো দৃষ্টান্ত অনুপস্থিত। পূর্ব বাংলার এতদঞ্চল সব সময়ই ছিল জলাভূমি অধ্যুষিত, ঝড়-ঝঞ্ঝার দেশ। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্পকলা চর্চার যে সমৃদ্ধ দৃষ্টান্ত রয়েছে– তা পূর্ববঙ্গে ছিল না। কিছু ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির শিল্প ঐতিহ্যের নিদর্শন ও লোকশিল্পের একটি ক্ষীণ ধারা এ অঞ্চলের শিল্পচর্চারূপে টিকে ছিল।

চিত্রশিল্পের চর্চা দূরের কথা– কোনো শিল্পকলা অনেকেই দেখেনি– এই প্রথম দিকের শিক্ষার্থীরা। জমিজমা চাষ গ্রামীণ জীবনযাপন– একটু অবস্থাপন্ন হলেই ভদ্রলোক হওয়ার প্রবণতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডিতে ঘোরাফেরা– নিদেনপক্ষে একটা কেরানির চাকরি, স্কুলের শিক্ষক, আরো একটু বাড়িয়ে হলে দারোগা ও উকিল-মোক্তার হওয়াই ছিল যাদের কাম্য– সেই নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেরা চাল চুলোহীন ও অন্ধকার ভবিষ্যৎ জেনেও শিল্পকলা চর্চায় কেন আগ্রহী হয়েছিল সেটা ছিল যেমন অবাক হওয়ার বিষয় তেমনি মাত্র চার-পাঁচ বছরেই চিত্রকলা চর্চার যে বলিষ্ঠ অনুশীলন নিদর্শন ও ফলাফল নিয়ে হাজির হলো (প্রথম কয়েক বছরের ছাত্ররা) যা ছিল আরো বিস্ময়কর। না থাকুক তাদের শিল্পকলা চর্চার ঐতিহ্য কিংবা না দেখুক বিশ্বের উল্লেখযোগ্য শিল্পকলা, ষড়ঋতুর আবর্তিত বাংলার নিসর্গ রূপ তো তারা অবলোকন করেছে। দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেত, বৃষ্টিস্নাত বর্ষার শ্যামল রং, নদীর নীল-কালো পানি, নদীর বাঁক, সারি সারি নৌকা, পাল তোলা নৌকা, নীলাকাশ, বকের সারি, মাঝি-মাল্লা, চাষী, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি তথা খেটে খাওয়া মানুষ নিয়েই যাদের একমাত্র অভিজ্ঞতা আর তারা অভিভূত– জয়নুলের জীবনমুখী দুর্ভিক্ষ চিত্রমালায়– এই সামান্য পুঁজিনির্ভর শিল্প চেতনা নিয়ে জয়নুল, কামরুল, শফিউদ্দিন, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন ও ছিলেন। আসলে পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, চারুকলা একই সঙ্গে সংস্কারমুক্ত চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় শিল্প ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে প্রতিষ্ঠাপেয়েছিল। এভাবে চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চাশের দশক ও ষাটের দশক ধরে চারুকলা শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন ঘটে। শুরুতে কলকাতা কেন্দ্রিক পাঠ্যসূচি ও শিক্ষা পদ্ধতি, তারপর ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক ধারার প্রতিফলন, লোকশিল্পের রসদ গ্রহণ, সংস্কারমুক্ত প্রগতিশীল বোধ ও উপলব্ধির আবহ সৃষ্টি করে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাংলাদেশের চারুকলা এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-রূপ পরিগ্রহ করে। তাই আমরা বলতে পারি, পঞ্চাশের দশক হলো পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের চারুকলা প্রতিষ্ঠার দশক এবং ষাটের দশক হলো চারুকলার বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের দশক। বস্তুত ষাটের দশকে বাংলাদেশের চিত্রকলার যে রূপ-বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা পেলো সেই বৈশিষ্ট্যধারা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে একাত্তরে স্বাধীনতা অর্জনের পর বেশ কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন হয়ে আজ ৫০০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশের চারুকলার

চারুকলা ইন্সটিটিউট, ঢাকা

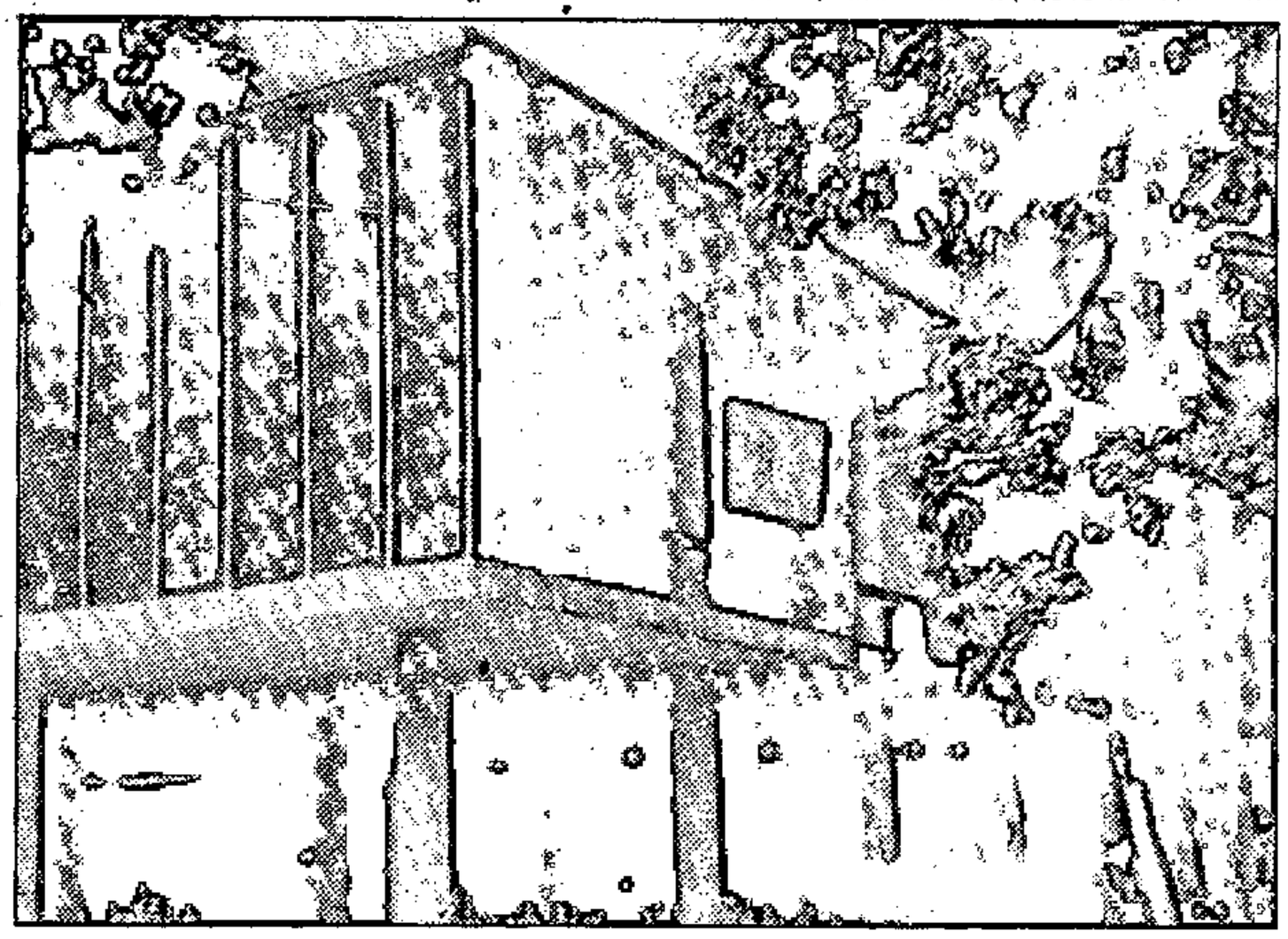

খাজা শফিকের কলা পাঠ্যসূচিকে অবলম্বন করেই ঢাকার চারুকলার ক্ষেত্রটিকে বিকশিত করে তুললো। তাঁদের শিল্পকলায় বিবৃত হলো পূর্ববাংলার শ্যামল প্রকৃতির রূপ-জীবন, মানুষ বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ বিষয়ের দিক থেকে, তত্ত্ব ও দর্শনে নতুন চিন্তা ও চেতনার সমাবেশ ঘটিয়ে ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা এতদঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য নির্মাণের সম্ভাবনার দিক উন্মোচন করলে।

পাঁচ বছরের শিক্ষা কোর্স শেষ করে একদল তরুণ শিল্পকর্মী উচ্চশিক্ষার্থে চলে গেলেন স্পেন, ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও জাপানে। দুতিন বছর পরই তারা ফিরে এসে অনেকেই যোগ দেন চারুকলার শিক্ষকতায়। ফলে ঢাকার চারুকলা শিক্ষা পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক শিল্পচর্চার করণ-কৌশল ও চিন্তার ধারা যোগ হয়। ইতিমধ্যে শিক্ষক শিল্পীরা অনেকেই এবং নতুন শিল্পীরাও নিজস্ব শিল্প ঐতিহ্য খুঁজতে গিয়ে লোকশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। নকশী কাঁথা, লক্ষ্মী সরা, জামদানি, কাঠের পুতুল, পোড়া মাটির পুতুল, শখের হাঁড়ি আলপনা ইত্যাদি সব লোকশিল্প আমাদের শিল্পীদের বোধকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে। যার উদ্ভাস পরিলক্ষিত হয় তাদের নতুন নতুন শিল্প সৃষ্টিতে। শিল্পকলা চর্চার শুরু থেকেই আমাদের সেই প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের সেই সময়কার প্রগতিশীল ও আধুনিক সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক ও অন্যান্য সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। তৎকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন শিল্পীরা। মার্কসীয় তত্ত্ব ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস স্থাপন ও আস্থাশীল ছিলেন অনেকেই। অন্যদিকে লেখক, সাংবাদিক তথা প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীরাও চারুকলা প্রতিষ্ঠায় পূর্ণভাবে সচেষ্ট বর্তমান রূপটি একটি বিশেষ মাত্রা বা অবস্থানে এসে পৌঁছেছে। তাই বলা যায়– শুরু থেকেই চারুকলা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক শক্ত ভিতের ওপর– যা সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক ও জীবনমুখী।

২.

গত ৫০ বছরে চারুকলার শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক সমস্যা থাকলেও যথেষ্ট সম্ভাবনাকে আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছি। সংস্কৃতির অন্যান্য শাখা– সংগীত, চলচ্চিত্র, নৃত্য ও খেলাধুলার তুলনায় চারুকলার অবস্থান সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের চারুকলা বিশিষ্টতার কারণে পরিচিত। বিদেশে নিয়মিত প্রদর্শনী, সেমিনার ও সম্মেলনে বাংলাদেশের শিল্পকলা প্রদর্শিত হচ্ছে, বাংলাদেশের শিল্পীরা আমন্ত্রিত হচ্ছেন। বিশ্বের অনেক উল্লেখযোগ্য জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় বাংলাদেশের শিল্পকলা সংগ্রহ হচ্ছে। বাংলাদেশেও দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক শিল্পকলা প্রদর্শনী ও সম্মেলন অত্যন্ত সফলভাবেই সঙ্ঘটিত হচ্ছে।

অন্যদিকে চারুকলা চর্চা পেশা হিসেবে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। জীবনযাপনে চারুকলার প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয়। সমাজ জীবনে একজন ডাক্তার, একজন প্রকৌশলী, শিক্ষক, আইনজ্ঞ যেমন প্রয়োজন তেমনি জীবনযাপনকে সুন্দর, রুচিশীল, সুশৃঙ্খল ও সৃষ্টিশীল করে গড়ে তুলতে একজন চারুশিল্পীর ভূমিকা সমানভাবে সমাদৃত।

চারুকলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বর্তমানে বিস্তৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শুধু চারুশিল্পী তৈরির জন্য নয় দেশে সুনাগরিক গড়ে তুলতে চারুকলা চর্চা যে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে তা এখন স্বীকৃত। তাই দেশের শিক্ষানীতিতে অন্যান্য বিষয়ের মতো চারুকলা তথা ললিতকলাকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কুদরাত-